ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 104-111
www.athenajournalcbm.in

স্বতন্ত্র লোক-সংস্কৃতির ধারা ও জাতিসত্তা নির্মাণে স্বাধীনতোত্তর শেরশাবাদিয়া কাঁথাশিল্প

হোসনেয়ারা খাতুন*

প্রাপ্ত: ০৩/০৩/২০২২ পরিমার্জন: ২৭/০৫/২০২২ গৃহীত: ৩০/০৬/২০২২

সারসংক্ষেপ: *লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ধারা হল লোকশিল্প। প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিভিন্ন লোকশিল্পকলা জন্ম নিলেও কালক্রমে তা সচেতন বা অবচেতন ভাবে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্বতন্ত্র লোকধারার জন্ম দেয়, যা অনেক সময় একটি জাতি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নির্মাণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাঁথা এইরকম একটি নারী কেন্দ্রিক লোকশিল্প যা আবহমানকাল থেকে বাঙালি জাতির লোকজীবনের নানা সাংস্কৃতিক রীতিনীতির অঙ্গ হিসেবে এই জাতির নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী ধারার জন্ম দিয়েছে, যা তাকে অন্য জাতি গোষ্ঠী থেকে আলাদা জাতিসত্তা নির্মাণে সাহায্য করে। এই প্রবন্ধে কাঁথা শিল্পের বিকাশ, ধরন ও কিভাবে এই ঐতিহ্যকে ঘিরে বৃহত্তর সমাজের অংশ হয়েও শেরশাবাদিয়া জনজাতির নানা সাংস্কৃতিক নির্মাণ এই সমাজকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা রক্ষায় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আলোকপাত করা হবে।*

সূচক শব্দ: *লোকসংস্কৃতি, কাঁথাশিল্প, শেরশাদিয়া জনজাতি, লৌকিক সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, নারী স্বতন্ত্র শিল্প সত্তা, কাঁথা সিয়ানি গীদ, বাণিজ্যিকীকরণ, কারুশিল্পের পতন।*

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: hosneara1983@gmail.com

বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভিন্নতার জন্য বাঙালি জাতি নানা জাতি ও উপ-জনজাতিতে বিভক্ত এবং এই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা প্রায় প্রতিটি জাতির কিছু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতাবোধের জন্ম দিয়েছে। লোক-সংস্কৃতি হল এই রকমই একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ধারা যা এই জনজাতিগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোক-সংস্কৃতি হল লোকমন ও লোকচিন্তা, চেতনা ও অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন। পরিকল্পনা বিহীন উচ্ছাস-আবেগে ভরা সুখ-দুঃখের লৌকিক জীবনের বিভিন্ন ধারা লোক মুখে, কর্মে ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে একটি সমাজের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্বতন্ত্র সত্তাকে বহন করে। এই সংস্কৃতি যেমন একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নির্মাণ করে তেমনি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভাবনা দিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মানবিক সেতুবন্ধন রচনা করে। ঐতিহাসিক ওয়াকিল আহমদ মনে করেন "মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকলা সংস্কৃতির অঙ্গ, কিন্তু সংস্কৃতির বাহনরূপে যে জগৎ ও জীবনের পরিচয় ফুটে উঠে-সংস্কৃতির উপকরণ সেখানেও বিদ্যমান"[১]।

বাঙালি জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শেরশাবাদিয়া সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও এই জাতির নিজস্ব ভিন্ন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছে। আবহমানকাল ধরে বিদ্যমান এই জাতির সাধারণ মানুষের লোককাহিনী, ছড়া, ধাঁধা, শিল্পকলা, লোকাচার, লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার ও লৌকিক খেলাধূলা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের কৌতুহল জেগেছে সম্প্রতি। বাঙালি জাতির লোক-সংস্কৃতি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও এই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি।

শেরশাবাদিয়া জনজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শেরশাবাদিয়া জাতি মুলত বাঙালী জাতি। আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলে। প্রভাতরঞ্জন সরকার যে বারোটি উপভাষা অঞ্চলে বাংলাকে ভাগ করেন তার একটি হল শেরশাবাদিয়া উপভাষাঞ্চল[২]। শেরশাবাদিয়া জাতি মধ্যযুগ থেকে বাংলার নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতো। এই জনজাতি বর্তমানে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ (মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর জেলা), বিহার (কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশানগঞ্জ, সুপুল, আরারিয়া জেলা), ঝাড়খণ্ড (সাহেবগঞ্জ, পাকুড় জেলা) প্রভৃতি রাজ্যের নদী সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দা। এছাড়াও বাংলাদেশের রাজশাহী, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা বিতর্ক রয়েছে। অনেকে শেরশাহ সূরীর সঙ্গে এই জাতির উৎপত্তি সম্পৃক্ত করেন। তারা মনে করেন বাংলা জয়ের জন্য যে বিশাল সংখ্যক সৈন্য বাহিনী উত্তর ভারত থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাদের অনেকেই এই বাংলায় বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে তারা শেরশাবাদিয়া নামে পরিচিত হয়[৩]। আবার এই মতের বিরোধিতা করে বলা হয় যে স্থান নাম থেকে এই জনজাতির নামকরণ করা হয়েছে। বাংলার 'শেরশাবাদ' পরগণার অধিবাসীরা কালক্রমে শেরশাবাদিয়া নামে পরিচিত হয়[৪]। কৃষিকাজ প্রধান জীবিকা হলেও নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা হিসেবে মাছ ধরা এই জাতির অন্যতম পেশা ও নেশা।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া বা ওয়াহাবী আন্দোলন সংগঠিত হয়, তাতে এই শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন জড়িত ছিল। তাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এদের অপরাধপ্রবণ গোত্র হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিল, যদিও পরে তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল[৫]। ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রি.) সৌদি আরবের নজদ প্রদেশে। ইসলামকে তার আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে আনা ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন শুরু করেন সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.)। বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেন মীর নেসার আলী তিতুমীর (১৭৮১-১৮৩১ খ্রি.)। এই আন্দোলনের তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ ও শিখ বিরোধী আন্দোলন এবং বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে দ্বিতীয়[৬] দফা ও পাটনা কেন্দ্রিক এনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির নেতৃত্বে তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন। এই তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে ১৮৩১ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে সীমান্ত প্রদেশে এই ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে টাকা ও মানুষের স্রোত অবিরাম বয়ে গেছে বলে হান্টার তার বইয়ে উল্লেখ করেন[৭]।

এই আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার মধ্যে মালদা জেলা ছিল অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই জেলার সব থেকে প্রভাবিত কেন্দ্র ছিল শিবগঞ্জ, কানসাট, নবাবগঞ্জ, কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, এবং ওল্ড মালদা। রফিক মণ্ডল ও তার সুযোগ্য পুত্র আমিরুদ্দিন মণ্ডল এই অঞ্চলের নেতা ছিলেন[৮]। তাদের শহীদ হওয়ার পরেও সাহাবানচকের হাবেলাশ মণ্ডল এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান[৯]। ১৮৭২ সালে তাদের গ্রেফতারের পর থেকে এই আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে। এই অঞ্চল গুলির বেশিরভাগ মানুষ শেরশাবাদিয়া জনজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং এখনও অনেকে এই মতাদর্শের অনুসরণ করে চলে যদিও তাতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাই বলা যায় বাংলায় বিশেষ করে রাজশাহী ডিভিশনে ওয়াহাবী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় প্রধানত এই শেরশাবাদিয়া জাতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নিদর্শন হল কাঁথা। এই সম্প্রদায়ের নারীদের শৈল্পিক মনের অনবদ্য নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীক। তাদের শৈল্পিক মনের মাধুরী মেশানো রূপ-রস এবং বর্ণ-বৈচিত্র ফুটে ওঠে নিপুণ হস্তের সুই-ধাগার ছন্দময় বুননে। এই কাঁথায় শেরশাবাদিয়া সমাজের শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ-সভ্যতা, প্রকৃতি প্রভৃতির ছবিও ফুটে ওঠে। বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক এই কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য সাহিত্য কর্ম। কবি জসিমউদ্দিনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' এক অসাধারণ লেখনী যেখানে প্রেমিক রুপাই ও সাজুর প্রেম ও বিরহের এক মরমী কাহিনী ফুটে উঠেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

কাঁথার প্রচলন দুই বাংলা জুড়েই আছে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনাসহ সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাঁথা বানানোর সংস্কৃতি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহারেও দেখা যায় বৈচিত্রপূর্ণ কাঁথার সমাহার। বিহারের 'সুজনী' কাঁথার আছে আন্তর্জাতিক মহলে 'ভৌগোলিক স্বীকৃতি'[১০]। যদিও একই নামে এবং প্রায় একই ধরনের কাঁথা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। শেরশাবাদিয়া সমাজের এই সূচিকর্ম মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর জেলা, কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশানগঞ্জ, আরারিয়া, সুপুল, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, প্রভৃতি জেলার বাসিন্দা মধ্যে প্রচলিত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশের রাজশাহী, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে[১১]।

বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ও নিজস্ব শিল্পসত্তা নির্মাণ

কাঁথা প্রকৃতিগত দিক থেকে একই হলেও শেরশাবাদিয়া রমণীদের সূচিকর্ম বাংলাদেশের বা ভারতের কোন সম্প্রদায়ের নারীদের বুনন প্যাটার্ন থেকে স্বতন্ত্র। কাঁথার বুনন-প্যাটার্ন ও নকশার আদলে রয়েছে তাদের নিজস্ব শৈল্পিক ভাবনার প্রতিফলন। শেরশাবাদিয়া কাঁথাকে অনেকে বাংলাদেশের ও ভারতের নকশী কাঁথার মত মনে করলেও তা ব্যবহারিক ও বুনন-প্যাটার্নের দিক থেকে আলাদা। দুই কাঁথার প্রকৃতি ও ধরনে মিল থাকলেও বুনন, নকশার আদল ভিন্ন প্রকৃতির (কাঁথা চিত্র-১ ও ২)। নকশীকাঁথা শীত কাঁথা ও ফেন্সি বিছানার চাদর হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হলেও শেরশাবাদিয়া কাঁথা বিছানার চাদর হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হয়। নকশীকাঁথায় সেলাই সংঘবদ্ধভাবে থাকে না, বিভিন্ন নকশা আলাদা আলাদা করে মাঝে জায়গা ছেড়ে করা হয়। কিন্তু শেরশাবাদিয়া নারীদের কাঁথায় ফাঁকা জায়গা না ছেড়ে একদিক থেকে ধাগার সংঘবদ্ধ ফোঁড়ের দ্বারা নকশা করা হয় এবং দুই দিকেই ডিজাইন ফুটে ওঠে। সদর বা মফস্বল প্রায় বোঝা যায় না। শেরশাবাদিয়া কাঁথার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এইগুলোর সেলাই এত ঘন ও মজবুত থাকে যে বেশ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত চলে, সহজে ছিঁড়ে না। কাপড় ক্ষয় হয়ে অপসারিত হয়ে গেলেও সেলাই সহজে কাটে না[১২]।

আগে পুরানো ছেঁড়া কাপড়কে জোড়া লাগিয়ে কাঁথা তৈরি হত। স্বল্প ছেঁড়া, পুরোনো শাড়ি, লুঙ্গির কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। উপনিবেশিক শাসনামলে মহিলারা একরকম মোটা শাড়ি পড়ত যা 'ঠেঠি' নামে পরিচিত ছিল[১৪]। টেকসই ও মোটা হওয়ার কারণে এই শাড়ি কাঁথা বানানোর জন্য আদর্শ মনে করা হত। তবে কালক্রমে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ফলে আশির-নব্বইয়ের দশক থেকে জীর্ণ কাপড়ের পরিবর্তে আধ-পুরানা এবং বহিরঙ্গে নতুন

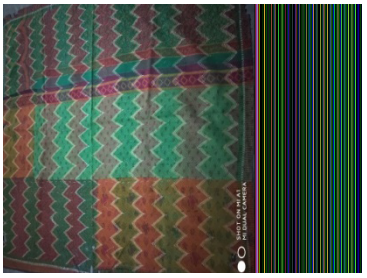

চিত্র-১ নকশী কাঁথা[১৩]

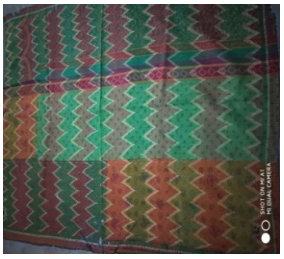

চিত্র-২ শেরশাবাদিয়া কাঁথা (ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

কাপড় ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পাঁচ থেকে সাতটি পুর (স্তর) পর পর সাজিয়ে ধাগা দিয়ে বড় ফোঁড় দিয়ে জোড়া লাগানো হয়[১৫]। বিভিন্ন নকশার সেলাই দিয়ে যেমন যেমন কাঁথা সমপন্ন হতে থাকে তেমন তেমন এই ফোঁড় গুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়, ফুটে ওঠে নতুন বাহারি নকশা।

কাঁথার প্রকারভেদ

গ্রাম বাংলার মানুষ নানা কাজে কাঁথা ব্যবহার করে। ব্যবহারের দিক থেকে নানা আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়। কবি জসিমউদ্দিন একটি প্রবন্ধে ব্যবহারিক তারতম্যের ভিত্তিতে সাত রকম কাঁথার নাম বলেছেন:

১) পান-সুপারি রাখার খিচা
২) তসবি রাখার থলিয়া
৩) ফকিরের ভিক্ষার ঝুলি
৪) বালিশের বেটন
৫) সারিন্দা-দোতারা রাখার আবরণী
৬) কুরআন শরীফ রাখার ঝোলা
৭) গায়ে দেওয়ার কাঁথা [১৬]।

এগুলোর মধ্যে স্বাধীনতোত্তর কালে বালিশের উপরকার কাঁথা বা বেটন শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া তোষকের পরিবর্তে অনেকটা কাঁথার মত বড় বড় ফোঁড় দিয়ে বুনানো গোদলা ব্যবহারের প্রচলন আজও আছে[১৭]।

এই লোকশিল্প প্রয়োজন মত চৌকি, খাটলা/খাটিয়া ইত্যাদির পরিমাপে বানানো হতো, নির্দিষ্ট কোন পরিমাপ ছিল না। বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়, পাইড় ও নকশা অনুযায়ী কাঁথা নানান রকম হয় এবং সেই অনুযায়ী নামকরণ হয়। যেমন, ভাঙ্গা ফোড়/চটসিয়ানী, জন্জরাপেটি, লোহিরা, কাঁটা-লোহিরা, বিট ফুল, লাঠি বিঠ, লাঠি ফুল, কোতরখাপী, চ্যারচালা, পান-কাঁথা ও পান ফুল ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ওয়াকিল আহমদ চিত্রের তারতম্যে কাঁথার বিভিন্ন নামকরণের উল্লেখ করেন যেমন-লহিরা, চারচালা, পিঁপড়াসারী, ক'তরখুপি, বর্ফি, বিট ও চট কাঁথা[১৮]। অঞ্চল ভেদে নামকরণে অল্প ভিন্নতা থাকলেও নকশা প্রায় একই রকম। লোহিরা/লহিরা (শেরশাবাদিয়া ভাষায় ল্যাহর মানে ঢেউ) ঢেউতোলা নকশার কাঁথাকে বলে। বুননের নকশা এমনভাবে কাঁথায় ফুটিয়ে তোলা হয় যেন দেখতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত লাগে। চারচালার ঘরের মত নকশা করা কাঁথাকে চারচালা, পায়রার খোপের মত দেখতে ক'তরখুপি, সারিবদ্ধ পিঁপড়ার মত নকশাওয়ালাকে পিঁপড়াসারী বলে[১৯]। বর্ফি একটি মোটিফ। বিট কাঁথায় ত্রিভুজ নকশা থাকে। চটের মত ঘন বুনটের সূচিকর্মকে চটসিয়ানী বা চট কাঁথা বলে। এগুলো এক এক ডিজাইনের চারুকলা[২০]। প্রতি ফোঁড়ে শেরশাবাদিয়া সমাজের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বহন করে। যেমন জন্জরাপেটি ফোঁড়ে পাকা ভুট্টার নকশা, পান ফুলে পান পাতার ছবি ফুটে ওঠে। তবে শেরশাবাদিয়া কাঁথায় কখনো প্রাণীর মোটিফ বা ছবি নকশা করা হয় না। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস হল প্রাণীর ছবি যুক্ত কাঁথা ঘরে থাকলে দয়ার

ফেরেশতারা ঘরে প্রবেশ করবে না, বাড়িতে সমৃদ্ধি আসবে না, এমনকি অনেকে বিশ্বাস করে নামাজও আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না[২১]। তাই এই সমাজের কাঁথাগুলিতে গাছ, লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে। আবহমান কাল থেকে এই সমাজের মেয়েদের ছোট থেকে বিভিন্ন কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কাঁথা ছাড়া ও বিভিন্ন রকম সুজনী, রুমাল, টেবিল ক্লথ, সোয়েটার প্রভৃতি এই সমাজের নারীদের কারুশিল্পের পরিচয় বহন করে। উপনিবেশিক যুগ থেকে এই সব কাঁথার প্রচলন ছিল। ১৯২৯ সালের লোহিরা ডিজাইনের কাঁথা বিহারের বাথনা গ্রামে পাওয়া যায়। একই নকশার কাঁথা তার পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের হাতেও তৈরি হয়। স্বাধীনতার পরেও পশ্চিমবঙ্গে এই সমাজের প্রায় ঘরে ঘরে এই সব কাঁথা সেলাই করা হত। অঞ্চল ভেদে আশি নব্বই দশকের পর থেকে এই লৌকিক সংস্কৃতিতে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদ ও মালদার দিয়ারা এলাকায় বিড়ির ব্যাপক প্রসারণ এই লৌকশিল্পের পতন ডেকে আনে। তবে মালদার টাল ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে এই সূচিকর্ম তখনও জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এই লৌকশিল্প তার কালিন্য হারিয়েছে।

স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

ঐতিহ্যবাহী ধারা হিসেবে এই কাঁথা শেরশাবাদিয়া জনজাতির বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। এই কারুশিল্প এই সমাজের মেয়েদের কাছে এতটাই মূল্যবান ঐতিহ্যবাহী অমূল্য সম্পদ যে এটা তাদের মধ্যে বিক্রি করার প্রথা নেই[২২]। এই সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে যে 'মেয়েরা কাঁথা আর গহনা ছাড়া কিছু বোঝেনা'। কাঁথার ব্যবহারের সঙ্গে এই সমাজের নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আচার-আচরণগত বুনিয়াদি প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁথা সাধারণত বিছানা আরামদায়ক করার জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু কালক্রমে এই সূচিকর্ম নানা সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যেমন বাড়িতে কোন বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজন এলে তাঁর সম্মানার্থে এই কাঁথা বিছানায় পেতে দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে বেহাই, (মেয়ের শশুর), জামাই, মেয়েরবাড়ি বাবা গেলে নতুন কাঁথা বিছানায় শোভা পেত। মর্যাদাবান অতিথি যেমন মেয়ে বা ছেলে দেখা অতিথি, পীর, মৌলবীসাহেব প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হত[২৩]। এছাড়াও বরযাত্রীকে ও কনেযাত্রী বসার ফরাস হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং এই কাঁথা চুরি করে নিয়ে আসা বিয়ের একরকম মস্করা মূলক প্রথা হিসেবে শেরশাবাদিয়া সমাজের বহুল প্রচলিত রীতি বলে মনে করা হয়[২৪]। জলসার স্টেজেও অনেক অঞ্চলে এই কাঁথা পেতে দেওয়া হতো।

কাঁথা বিক্রি না করা হলেও বিভিন্ন রকম উপলক্ষে এই লোকশিল্প উপহার ও দান করা হত। প্রথম সন্তান জন্মের পর মেয়ে যখন বাবার বাড়ি থেকে 'বাচ্চা হাওয়া' বিদায় নিত তখন অন্যন্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সঙ্গে নানারকম কাঁথা প্রায় আবশ্যিক ভাবে দেওয়া হতো। সাধারণত নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, নতুন সন্তানকে দেখতে গেলে, নতুন বধূর বাসরের বিছানায়, বড় নাতি-নাতনীকে (দিদিমা বা ঠাকুমা), মেয়ের শশুরকে কাঁথা উপহার হিসেবে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কোন বিশেষ অতিথি বাড়ি বেড়াতে এলে বিশেষ করে পীরকে উপহার হিসেবে দেওয়া হতো। এছাড়াও মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য জলসায় কাঁথা দান করা বেশ জনপ্রিয় একটি রীতি। এর মাধ্যমে নারীদের ধার্মিক মননের পরিচয় ফুটে ওঠে। এই ধরনের কাঁথা গুলো নিলামে বিক্রি করে তার অর্থ মসজিদ বা মাদ্রাসার উন্নয়নে ব্যবহৃত হত[২৫]।

শেরশাবাদিয়া নারীরা কাজ থেকে অবসর পেলেই কাঁথার ডালি নিয়ে বসত। এগুলো সেলাই করার নির্দিষ্ট কোন মরসুম না থাকলেও বর্ষাকালে এবং রমজান মাসে গৃহস্থালীর কাজের চাপ অনেকটা হালকা থাকে তখন গাঁয়ের রমণী-মেয়ে, বউ, বয়স্ক সবাই বাড়ির উঠানে, গাছের তলায়, পড়শীর কোন পরিসর জায়গায় গোল হয়ে পিড়ি পেতে সামনে ডালিতে কাঁথা নিয়ে সেলাই করতে বসে, সঙ্গে চলে নানান সুখ-দুখের গল্প, শাশুড়ি-বউমা, ননদ-ভাবির দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনের কেচ্ছা এবং গীদ। বিয়ের গীদ থেকে এগুলো একটু আলাদা হয়। নিত্যদিনের চাওয়া-পাওয়া, প্রেম প্রীতি, বিচ্ছেদ ইত্যাদি উপজীব্য নিয়ে গীদের কথা তৈরি হয়। দীর্ঘক্ষণ বসে বসে একঘেঁয়ে সেলাইয়ের কাজ করতে করতে যেমন কোমর-পিঠে টান ধরে তেমন মনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ওঠে। তখন সবাই এই ঝিমুনি কাটানোর জন্য ঝুঁকে ঝুঁকে একসাথে গীত গেয়ে ওঠে[২৬]। যেমন—

"বড় নেমুর তলে নাজির্যা ক্যাঁথা সিঁয়াইছে
আহা ভেস গুলাবি নেমু হামার ডালে ধইর্যাছে।
ক্যাঁথা সিঁয়্যা দ্যাখে হাসিবুর গাছে চোড়হ্যাছে
গাছে চোড়হ্যা হাসিবুর নেমু ফেল্যাছে,
সে না নেমু খাইয়্যা নাজির্যার প্যাট হৈয়্যাছে"।

কিংবা

"বাবলার গাছে পুয়ালের ঠুসি
বাবলার গাছে পুয়ালের ঠুসি,
ননদিনী তোমার ভ্যাই কেনে বিদ্যাশী।
মন লাগে না কামে-কাজে
রাস্তা চ্যাহ্যা বৈস্যা থাকি।
ও ননদিনী, তোমার ভ্যাই কেনে বিদ্যাশী"।

অথবা,

"মাগে মা আ আ.....
কুন দ্যাশে বিহ্যা দিলি
ক্যাইয়্যা উড়ে না।
আগে যুতি জানতুঙ
পালকি ধৈরা টানতুঙ,
মাগে মা আ আ.....
কুন দ্যাশে বিহ্যা দিলি
ক্যাইয়্যা উড়ে না।
বাঁশের পাতা লড়ে-চড়ে
মা কৈহ্যা মনে পড়ে।
মাগে মা আ আ.....
কুন দ্যাশে বিহ্যা দিলি
ক্যাইয়্যা উড়ে না"[২৭]।

কাঁথা সেলাইয়ের সঙ্গে যে গল্প চলে তা সেলাইয়ের ফোঁড়ের তালে লম্বা হতে থাকে। এই জন্য একে কেন্দ্র করে সমাজে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে-লম্বা কোন গল্প হলে বলা হয় 'কাঁথা সিয়ানী গল্প', যা শেষ হয় না বা অনেক লম্বা সময় ধরে চলে। গ্রাম্য জীবনের নিত্য অনটনের মধ্যে উচ্চাভিলাষী হওয়ারও চিত্রও ফুটে ওঠে এই কাঁথাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাগধারায়। কেউ সাধারণ অবস্থা থেকে বড়লোক হওয়ার স্বপনে বিভোর হলে তাকে উপহাস অর্থে বলে 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে'।

সাধারণত বাড়ির সব কাজ সেরে দুপুরের পর থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত চলতে থাকে হস্তশিল্পের এই চিরাচরিত কারসাজি। বড় বিছানার একটি কাঁথা সেলাই করতে এক বছর লেগে যেত তবে লাগাতার সেলাই করার সুযোগ পেলে পাঁচ বা সাত মাসে শেষ করা যায়। একটা কাঁথা এক সময়ে একজন শিল্পীই সেলাই করে। ফলে ধীরে ধীরে কারুকার্য ফুটিয়ে

একজন হস্তশিল্পীর সেলাই করতে সময় লাগে। আবার অনেকে কাঁথার জমিন পেড়ে সেটা পেশাদার শিল্পীর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে সেলাই করে নিত।

শেরশাবাদিয়া সমাজের অন্যতম জনপ্রিয় এই লোকশিল্প আজ ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। কুঁঠি ভর্তি যে কাঁথা ছিল শেরশাবাদিয়া নারীর গর্বের সম্পদ আজ তার প্রায় কোন গুরুত্ব নেই। বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই শিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল কিন্ত বর্তমানে অধিকাংশ কাঁথা শিল্পী কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। এই কারুশিল্পের পতন নানা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত।

কাঁথা তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না করা, আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্যাশন অনুযায়ী পরিবর্তনের ব্যর্থতা, দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাদরের মত হালকা সুলভ না হওয়া এই শিল্পের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। কাঁথা সাধারণত বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার করা হত। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের এমন কোন পরিবার নেই যেখানে কাঁথা সেলাই করা বা ব্যবহার করা হতনা কিন্ত কালের বিবর্তনে চাদরের মুল্য সহজলভ্য হওয়ায় কাঁথা জনপ্রিয়তা হারায়। গৃহস্থালির কাজ-কর্মের পর অবসর সময়ে এই সূচিকর্মে নারীরা নিয়োজিত হত। এটা ছিল অবসর কর্ম। এই শিল্প কখনও সংসারের অর্থ সংস্থানের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠতে পারেনি। মেয়েলী স্তরে টুকটাক কাঁথা সেলাই করে অর্থ উপার্জিত হত। মেয়েলী কর্ম বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কখনোই এই শিল্পের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয়নি। কৃষিজীবী এই জাতি কখনো ব্যবসা বানিজ্যে আগ্রহী ছিলনা। সুতরাং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরও আলাদা করে ব্যবসা করা কল্পনার বাইরে ছিল।

এই লোকশিল্প অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি হলে ও কালক্রমে দুই বাংলার মানুষের মাঝের কাঁটাতার যেমন তাদের ভিন্ন করেছে তেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের সূচিকর্মে যেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তেমন মানুষের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন এসেছে। কিন্ত শেরশাবাদিয়া কাঁথা তাদের প্রথাগত রক্ষণশীল শৈল্পিক সত্তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, প্রয়োজনের ও আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্যাশন সচেতন হতে পারেনি। বাণিজ্যিক দিক থেকে কাঁথার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে এই কারুশিল্পের মাধ্যমে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্ত এই সমাজের ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে গ্রামাঞ্চলে কাঁথা অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। এর পরিবর্ত হিসেবে বিড়ি শিল্প অনেক বেশি লাভজনক। ফলে বিড়ি তৈরির প্রসারের ফলে এই শিল্প কদর হারায়। পরিশেষে বলা যায় বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিকে যে ভাবে পুনুরুজ্জীবিত করে মানুষের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থসংস্থানের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলার চেষ্টা হচ্ছে ঠিক সেই রকম ভাবে এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করলে আশা করা যায় বাংলাদেশ সরকারের মত বৈদেশিক মুদ্রার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক লোকশিল্পের মাধ্যমে এই জাতির নিজস্ব নান্দনিক ধারার সমাদার প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে এই লৌক-শিল্প কালক্রমে তার অতীত কালিন্য হারালেও শেরশাবাদিয়া জনজাতির নিজস্ব লৌকিক-সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। কাঁথা শিল্পকে ঘিরে যে সামোজিক ও সাংস্কৃতিক লোকাচার গড়ে উঠেছিল তা একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে এই সমাজকে ভিন্ন মাত্রার চরিত্র প্রদানে সহায়তা করেছে। ফলে বাঙালি বৃহত্তর সমাজের অংশ হয়েও নিজস্ব ভিন্ন বৃত্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েচছে। এছাড়াও এই শিল্পের মাধ্যমে এই সমাজের একদিকে যেমন গ্রাম্য নারীদের সুখ-দুঃখ, রূপ-রসের বিভিন্ন মরমী চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি তাদের স্বতন্ত্র শৈল্পিক ভাবনা এই জাতির আলাদা সাংস্কৃতিক চরিত্র নির্মাণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা কালক্রমে এই জনজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তার একটি দিক গড়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ:

১. আহমদ, ওয়াকিল, (১৯৬৫), *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* বাংলা একাডেমি, পৃ. ১।

২. Sarkar, Provatranjan, (1983). "Language and Dialect-1", (Discourse 7), *Barna Bijnan.*

৩. জনপ্রিয় জনশ্রুতি।

৪. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: অহাব, অধ্যাপক আব্দুল, (১৪২৭), শেরশাবাদ পরগণা ও শেরশাবাদিয়া জনজাতি: ঐতিহাসিক পরিচয়, *শেরশাবাদের কাগচ,* শরৎ সংখ্যা, ভাদ্র- আশ্বিন।

৫. Gopal, S, & Jha, Hetukar, (2008). (Ed.). *People of India Bihar* Vol. XVI Part II, Seagull Books, pp. 876-877.

৬. Hunter, H.H. (1876). *The Indian Mussalmans*, Trubner And Company, (reproduced by Sani H. Panhawar, California, 2015) pp. 23-25.

৭. *Ibid.,* p. 45.

৮. *Ibid., pp. 45-46.*

৯. Letter from J.H Reily, District Superintendent of Police to the Inspector-General, Lower Provinces, No.347, dated 17th June, 1870, Judicial Proceedings, GB Judicial Dept. August 1870, File No.130, pp. 22-23.

১০. https://roar.media/bangla/main/art-culture/nakshi-kantha-an-important-part-of-bengal-culture, accessed 19th November, 2020.

১১. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ২০১১-২০২১।

১২. সাক্ষাৎকার: শাইফুন নেশা, বয়স-৫৬, বড়কামাত, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ২০.৫.২০১৩।

১৩. https://roar.media/bangla/main/art-culture/nakshi-kantha-an-important-part-of-bengal-culture, accessed 19th November, 2020.

১৪. সাক্ষাৎকার: তাজকেরা খাতুন, বয়স-৫১, জগোন্নাথপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ১১.১০.২০২০।

১৫. *তদেব।*

১৬. জসিমউদ্দিন, কবি, (১৩৫৮), পূর্ববঙ্গের নকশী কাঁথা ও শাড়ী, *মাসিক মোহাম্মাদী,* বৈশাখ, পৃ. ৩৮১।

১৭. সাক্ষাৎকার: উজলেফা খাতুন, বয়স-৭৩, বাথনা, কাটিহার জেলা, বিহার, তারিখ: ১১.১০.২০১৬।

১৮. আহমদ, ওয়াকিল, (১৯৬৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৮।

১৯. সাক্ষাৎকার: তাজকেরা খাতুন, বয়স-৫১, জগোন্নাথপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ১১.১০.২০২০।

২০. আহমদ, ওয়াকিল, (১৯৬৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৮।

২১. সাক্ষাৎকার: তাজকেরা খাতুন, বয়স-৫১, জগোন্নাথপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ১১.১০.২০২০।

২২. সাক্ষাৎকার: সায়েমা খাতুন বয়স-৪১, বাথনা, কাটিহার জেলা, বিহার, তারিখ: ২০.৫.২০২০।

২৩. সাক্ষাৎকার: তাসলিমা খাতুন বয়স-৪৫, বাথনা, কাটিহার জেলা, বিহার, তারিখ: ২০.৫.২০২০।

২৪. সাক্ষাৎকার: শাইফুন নেশা, বয়স-৫৬, বড়কামাত, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ২০.৫.২০১৩।

২৫. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ২০১১-২০২১।

২৬. *তদেব।*

২৭. নিজস্ব সংগ্রহ।